সারসংক্ষেপ

"কুমিল্লা জেলার কৃষকগণ কর্তৃক অনুশীলনকৃত কৃষি কার্যক্রম, সমস্যা এবং সম্ভাবনা" (Agricultural Practices, Problems and Potentials of Farmers in Comilla District) শীর্ষক গবেষণা কর্মটি ২০১৬-২০১৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার চারটি উপজেলা যথা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বরুড়া ও চান্দিনায় বাস্তবায়িত হয়েছে। গবেষণায় নমুনা বাছাই-এর ক্ষেত্রে বহুধাপ-দৈবচয়ন পদ্ধতি (multistage random sampling technique) অনুসরণ করা হয়েছে। নমুনা সংখ্যা/আকার নিরূপণের জন্য পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। আনুপাতিক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে চারটি উপজেলা থেকে (আদর্শ সদর-২৭১, সদর দক্ষিণ-২৮০, বরুড়া-২৪৬, চান্দিনা-২৭৪ জন) নমুনা হিসেবে মোট ১০৭১ জন কৃষক (প্রান্তিক-৫৯৯, ক্ষুদ্র-৩৬৫, মাঝারী-৯৫ ও বড়-১২জন) বাছাইপূর্বক তাঁদের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা জরিপ ছাড়াও কেইস স্টাডি এবং দলীয় আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করেও সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সারণি ও চিত্রের সাহায্যে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখিত গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল কুমিল্লা জেলায় কৃষি কার্যক্রমে বিশেষ করে দানাদার শস্য, শাক-সবজি, পুকুরে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি প্রাণি পালন, সমাজিক বনায়ন এবং সেচ কার্যক্রমে কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে অত্র এলাকাসহ সমগ্র দেশের কৃষির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল ও সুপারিশ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

ধান আবাদের জমি দেশের অন্যান্য এলাকার মত কুমিল্লা এলাকায় দিন দিন কমে যাচ্ছে। দশ-পনর বৎসর আগে কুমিল্লা এলাকার কৃষকগণ গড়ে ০.৬৬-১.৬৫ একর জমিতে ধানের আবাদ করতো যা কমে এখন দাঁড়িয়েছে ০.৩৩-১.৩০ একরে। বর্তমানে কুমিল্লা এলকার শতকরা ৯০ ভাগ কৃষক জমি কর্ষণে ট্রাক্টর এবং ১০ ভাগ কৃষক পাওয়ার টিলার ব্যবহার করছে। দশ-পনের বৎসর আগে অত্র এলাকার কিছু কিছু কৃষক জমি কর্ষণে দেশীয় লাঙ্গল ব্যবহার করতো কিন্তু বর্তমানে কেহ দেশীয় লাঙ্গল ব্যবহার করে জমি কর্ষণ করে না।

ধান আবাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বোরো মৌসুমে অত্র এলাকার বেশীর ভাগ কৃষক ব্রিধান-২৮, ২৯, ও ৫৮ আবাদ করছে। দশ-পনের বৎসর আগে অত্র এলাকার কৃষকগণ বোরো মৌসুমে ব্রিধান-২৮ ও ২৯ জাতের ধান আবাদ করতো অর্থাৎ অত্র এলকার কৃষকগণ বর্তমানে বোরো মৌসুমে ব্রিধান-৫৮ নতুন আবাদ শুরু করেছে। আউশ মৌসুমে অত্র এলাকার বেশীর ভাগ কৃষক ব্রিধান-২৮, ৪৩, ও ৪৮ আবাদ করছে। দশ-পনের বৎসর আগে আউশ মৌসুমে অত্র এলাকার কৃষকগণ চায়না জাতের ধানসহ কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল এবং স্থানীয় জাতের ধান আবাদ করতো। আমন মৌসুমে অত্র এলাকার বেশীর ভাগ কৃষক ব্রিধান-২২, ২৩, ৪৬ ও ৪৯ আবাদ করছে। দশ-পনের বৎসর আগে অমন মৌসুমে অত্র এলাকার কৃষকগণ ব্রিধান-৩ ও ১১ সহ কিছু স্থানীয় জাতের ধানও আবাদ করতো। এক কথায় বলা যায় বৎসরের তিন মৌসুমেই ধান আবাদের ক্ষেত্রে অত্র এলাকার কৃষকগণ বাংলাদেশ ধান গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের ধান সংগ্রহ করে তাঁদের জমিতে আবাদ করছে। কুমিল্লা এলাকার শতকরা ৬০ ভাগ কৃষক নিজস্ব

উৎসের ধান বীজ, শতকরা ২০ ভাগ কৃষক স্থানীয় বাজার হতে এবং শতকরা ২০ ভাগ কৃষক বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকে।

গড়ে বর্তমানে অত্র এলাকার কৃষকগণ বোরো মৌসুমে প্রতি একরে ৬৫-৬৭ মন, আউশ মৌসুমে ৪৫ মন এবং আমন মৌসুমে ৫৪ মন ধানের ফলন পাচ্ছে। দশ-পনর বৎসর আগে তাঁরা প্রতি একরে বোরো, আউশ ও আমন মৌসুমে গড়ে যথাক্রমে ৪৯-৫০ মন, ৩০ মন এবং ৩৮ মন ফলন পেত। অর্থাৎ প্রতি মৌসুমেই নতুন নতুন জাতের ধান আবাদ করায় তাঁদের গড় ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকগণ ধান আবাদের ক্ষেত্রে বোরো মৌসুমে আউশ ও আমন মৌসুমের চেয়ে বেশী রাসয়নিক সার ব্যবহার করে থাকে। বোরো মৌসুমে তাঁরা একর প্রতি ১২০ কেজি ইউরিয়া, ৬০ কেজি ট্রিপল সুপার ফসফেট, ৬০ কেজি মিউরেট অব পটাশ সার ব্যবহার করে থাকেন। আমন মৌসুমে তাঁরা একর প্রতি ৯০ কেজি ইউরিয়া, ৪৫ কেজি ট্রিপল সুপার ফসফেট, ৪৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ সার এবং আউশ মৌসুমে তাঁরা একর প্রতি ৬০ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি ট্রিপল সুপার ফসফেট, ৩০ কেজি মিউরেট অব পটাশ সার ব্যবহার করে থাকেন। সচরাচর কৃষকগণ গোবর কিংবা কোন প্রকার কম্পোস্ট সার ব্যবহার করেন না তবে ধান কাটার পর ধানের গোড়া মাটির সাথে মিশিয়ে থাকেন। জমিতে রাসয়নিক সার ব্যবহারের পূর্বে শতকরা একভাগেরও কম কৃষক মাটি পরীক্ষা করে থাকেন। জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্র এলকার অধিকাংশ কৃষক স্থানীয় সারের ডিলার ও উপসহুকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।

ধান আবাদের জমিতে সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ কৃষক গভীর নলকূপ, শতকরা ৭০ ভাগ কৃষক অগভীর নলকূপ এবং শতকরা ৫ভাগ কৃষক পাম্প মেশিন ব্যবহার করে থাকেন। তবে কুমিল্লার নিচু এলাকার শতকরা ৫০ ভাগ কৃষকই পাম্প মেশিন ব্যবহার করে থাকেন। বোরো মৌসুমে তাঁরা জমিতে গড়ে ৮-১২ বার সেচ প্রদান করে থাকে। আউশ মৌসুমে প্রয়োজন হলে ২-১ বার এবং আমন মৌসুমে কোন সেচ প্রদান করেন না। অত্র এলাকার শতকরা ৫০ ভাগ কৃষক জমির আগাছা দমনের জন্য হস্তচালিত উইডার এবং শতকরা ৫০ ভাগ কৃষক আগাছানাশক ব্যবহার করে থাকেন। ধান মাড়াইএর ক্ষেত্রে অত্র এলাকার প্রায় শতভাগ কৃষক প্যাডেল থ্রেসার ব্যবহার করে থাকেন। ধান আবাদের ক্ষেত্রে একর প্রতি তাঁদের উৎপাদন খরচ হয় ২৫,৬০০.০০ টাকা এবং ধান বিক্রি থেকে প্রাপ্ত আয় ৩৮,০০০.০০-৪২,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত।

ধান আবাদের ক্ষেত্রে কৃষকগণ সচরাচর যেসকল সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকে সেগুলো হ'ল- ধান মাড়াইকালে নিম্ন মূল্য প্রাপ্তি; ধান রোপণ ও মাড়াইকালে শ্রমিকের অভাব এবং উচ্চ শ্রম মজুরী; গভীর নলকূপের মালিক কর্তৃক অনিয়মিত সেচের পানি সরবরাহ; সরকারীভাবে ধান সংগ্রহকালীন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি

কুমিল্লা অঞ্চলে খুব অল্প সংখ্যক কৃষক রবি মৌসুমে গমের আবাদ করে থাকে। তাঁরা সচরাচর সোনালী, কাঞ্চন এবং প্রদীপ জাতের গমের আবাদ করে থাকে। গম আবাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কৃষক জমিতে এক ধরনের ভিটামিন ব্যবহার করে থাকে। গম আবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বের চেয়ে লাভবান হচ্ছেন। গম চাষীগণ খরা, ইদুরের আক্রমণ, স্বল্পমূল্য এবং গম আবাদে প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন। কুমিল্লা অঞ্চলে খুব অল্প সংখ্যক কৃষক ভুট্টার আবাদ করে থাকে। তাঁরা সচরাচর বারী, লালতীর,

জোয়ার, বর্ণালী, জয়, কৃষাণ ইত্যাদি জাতের গমের আবাদ করে থাকেন। ভুট্টা আবাদের অভিজ্ঞতা তাঁদের মাত্র ৩-৪ বৎসরের। আবাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কৃষক জমিতে এক ধরনের ভিটামিন ব্যবহার করে থাকে। ভুট্টা আবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বের চেয়ে লাভবান হচ্ছেন। ভুট্টা চাষীগণ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, পোকামাকড়-রোগবালাইর আক্রমণ, সার ও কীটনাশকের উচ্চ মূল্য, নিম্ন মানের বীজ, এবং ভুট্টার স্বল্প মূল্য ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন। কুমিল্লা অঞ্চলে খুব অল্প সংখ্যক কৃষক রবি মৌসুমে গোলআলুর আবাদ করে থাকে। তাঁরা সচরাচর ডায়মন্ড, মালটা, কার্ডিনাল, গ্যালোনা ইত্যাদি জাতের আলুর আবাদ করে থাকে। আলু আবাদের অভিজ্ঞতা তাঁদের মাত্র ১৮-২০ বৎসরের। আলু আবাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কৃষক জমিতে এক ধরনের ভিটামিন এবং চুন ব্যবহার করে থাকেন। আলু আবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বের চেয়ে লাভবান হচ্ছেন। আলু চাষীগণ ভাইরাসের আক্রমণ, পচে যাওয়া রোগ, বীজ, সার ও বালাই নাশকের উচ্চ মূল্য ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন। কুমিল্লা অঞ্চলে খুব অল্প সংখ্যক কৃষক রবি মৌসুমে মিষ্টিআলূর আবাদ করে থাকে। তাঁরা সচরাচর স্থানীয় জাতের মিষ্টিআলুর আবাদ করে থাকে। মিষ্টিআলু আবাদের অভিজ্ঞতা তাঁদের মাত্র ৮-১০ বৎসরের। মিষ্টিআলু আবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বের চেয়ে লাভবান হচ্ছেন। মিষ্টিআলু চাষীগণ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ স্বল্পমূল্য সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন।

কুমিল্লা অঞ্চলের কৃষকগণ বিভিন্ন রকমের সবজির (২৭ রকমের) আবাদ করে থাকে। বেশীরভাগ কৃষক টমেটো আবাদ করে থাকে এবং তার পরেই বেগুন ও সিম। এ সকল সবজি আবাদের অভিজ্ঞতা তাঁদের দীর্ঘ দিনের। তাঁরা সচরাচর উন্নত ও স্থানীয় জাতের সবজি আবাদ করে থাকে। সবজি আবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী লাভবান হচ্ছেন। সবজি চাষীগণ মৌসুমে সবজির স্বল্পমূল্য এবং রোগবালাই-এর অধিক আক্রমণজনিত সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন। অত্র অঞ্চলের কষকগণ বিভিন্ন রকমের মসলাজাতীয় ফসল যেমন মরিচ, সরিষা, রসুন, পিঁয়াজ, চিনাবাদাম, হলুদ, আদা ধনিয়াপাতা ইত্যাদির আবাদ করে থাকেন। বেশীরভাগ কৃষক মরিচের আবাদ করে থাকে এবং তার পরেই চিনাবাদামের। এ সকল সবজি আবাদের অভিজ্ঞতা তাঁদের দীর্ঘ দিনের। তাঁরা সচরাচর স্থানীয় জাতের মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ করে থাকে। এগুলো আবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী লাভবান হচ্ছেন। চাষীগণ রোগবালাই-এর অধিক আক্রমণ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা ঝর ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকেন।

কুমিল্লা অঞ্চলে বাড়ীর আঙ্গিনায় ফলের চাষ দিন দিন কমে যাচ্ছে কিন্তু মাঠের জমিতে ফলগাছ লাগানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকাংশ কৃষক (শতকরা ৮০ ভাগ) ছোট-ছোট গর্ত করে কোন প্রকার জৈব কিংবা রাসয়নিক সার ব্যবহার না করেই চারা রোপণ করে থাকেন। কিন্তু শতকরা ২০ ভাগ কৃষক ট্রাকটর দিয়ে জমি চাষের পর প্রয়োজনীয় আকৃতির গর্ত করে সুপারিশকৃত মাত্রায় জৈব ও রাসয়নিক সার প্রয়োগের পর ফলের চারা রোপণ করে থাকেন। দশ-পনের বৎসর আগে তাঁরা এ ধরনের গর্ত ও সার প্রয়োগে অভ্যস্থ ছিলেন না। বর্তমানে তাঁরা বিভিন আধুনিক জাতের ফলের বাগান করে থাকেন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে এগুলোর পরিচর্যাও করে থাকেন। সবচে' বেশী চাষ হচ্ছে কাঁঠালের এবং তারপরই আমের। তাঁরা বর্তমানে ফল চাষ করে অনেক লাভবান হচ্ছেন। কিন্তু ১০-১৫ বৎসর পূর্বে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু স্থানীয় জাতের ফল গাছ লাগাতো এবং অল্প বিস্তর লাভ করতে সক্ষম হ'ত। ফল চাষের ক্ষেত্রে অত্র এলাকার কৃষকগণ প্রায়শ:ই যে সকল সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকে সেগুলো হ'ল: মাড়াই-এর সময় ফলের দাম খুব

কম থাকে; ফল গাছ লাগানো এবং ফল পারার সময় শ্রমিকের উচ্চ মূল্য; ফল মজুত করে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই; পোকা-মাকড়ের আক্রমণ খুব বেশী। ঔষধি গাছ হিসেবে তারা সবচে' বেশী নিমগাছ এবং তারপর অর্জুন গাছ লাগিয়ে থাকে। কাঠ গাছ হিসেবে সবচে' বেশী লাগায় আকাশমনি গাছ এবং তারপর বেলজিয়াম গাছ। কাঠ গাছের সংখ্যা বর্তমানে ১০-১৫ বৎসর পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেশীর ভাগ কৃষকই এ সকল গাছ লাগিয়ে আগের চেয়ে লাভবান হচ্ছেন।

কুমিল্লা অঞ্চলের অনেক কৃষক তাদের পুকুরে মাছ চাষ করে থাকেন। তারা দেশীয় কার্প, বিদেশী কার্প এবং শিং-মাগুর ইত্যাদি মাছের চাষ করে থাকেন। তাঁরা বর্তমানে মাছ চাষ করে ১০-১৫ বৎসর পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী লাভবান হচ্ছেন। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাছের খাবারের উচ্চ মূল্য এবং রোগবালাই-এর আক্রমণকে প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লখ করেছেন।

অধিকাংশ কৃষকই বাড়ীতে হাঁস-মুরগি পালন করে থাকেন। হাঁসের ক্ষেত্রে তাঁরা খাকি ক্যাম্বেল, ইন্ডিয়ান রানার, পেকিন এবং দেশী জাত লালন-পালন করে থাকেন। মুরগির ক্ষেত্রে তাঁরা ব্রয়লার, লেয়ার এবং দেশী জাত পালন করছেন। অধিকাংশ কৃষকই হাঁস-মুরগির খাবার হিসেবে বাজার থেকে রেডিমেড খাবার কিনে থাকেন। তাছাড়াও তাঁরা খুদ, কুড়া, নিম্ন মানের চাল, ধান ইত্যাদিও বাজার থেকে খাদ্য হিসেবে ক্রয় করে থাকেন। হাঁস-মুরগির থাকার জন্য তাঁরা বর্তমানে ভালমানের আলাদা থাকার ঘর ব্যবহার করে থাকেন যা তাঁরা পূর্বে করতেন না। হাঁস-মুরগি পালনের ক্ষেত্রে রোগ-বালাই-এর আক্রমণকে প্রধান এবং মারাত্মক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও হাঁস-মুরগি পালনের স্বল্প জ্ঞান, খাবারের উচ্চ মূল্য, গুণসম্পন্ন মুরগির বাচ্চার অভাব, মুলধনের অভাব ইত্যাদি সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন।

গবাদি-প্রাণি পালনের ক্ষেত্রে দেশী এবং শংকর উভয় জাতই কৃষকগণ পালন করে থাকেন। গড়ে প্রতি কৃষকের গবাদি প্রাণির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে তবে গবাদি প্রাণি পালনের কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবাদি প্রাণি পালন করার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্র এলাকার কৃষকগণ পূর্বের তুলনায় লাভবান হচ্ছেন। তবে পশু খাদ্যের উচ্চ মূল্য প্রধান সমস্যা হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

কৃষকগণ অত্র এলাকায় প্রায় ১৯ ধরনের শস্য বিন্যাশ অনুসরণ করে থাকেন। বেশীর ভাগ কৃষকই ধান-ধান-ধান শস্য বিন্যাশ অনুসরণ করেন। এরপর অধিকাংশ কৃষক ধান-পতিত-ধান শস্য বিন্যাস অনুসরণ করে থাকেন।

প্রস্তাবিত সুপারিশমালাঃ

১. খামার পর্যায়ে কিংবা স্থানীয় বাজারে কৃষকের ধানের লাভজনক মূল্য নিশ্চিকরণের কার্যকরী উপায় অবলম্বন করতে হবে। যেমন-ধান উৎপাদনকারীদের ধানের যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষে পার্শ্ববর্তী দেশ হতে ধান ও চাল আমদানি বন্ধ করতে হবে। ধান-চাল কৃষকের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক সংগ্রহের ক্ষেত্রে কঠিন শর্তাবলী যেমন-আর্দ্রতার শতকরা হার, অপুষ্ট ধানের শতকরা হার ইত্যাদি সহজ করতে হবে। ধান ব্যবসায়ীদের নিকট হতে সংগ্রহ না করে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান-চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। সরকার কর্তৃক ধান-চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। ধানের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য বাংলাদেশের কৃষকদের জন উপযোগী/লাগসই যান্ত্রিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন গভীরনলকূপগুলো সমবায়ের আওতায় এনে সময়মত

যৌক্তিক মূল্যে সেচের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। রাসয়নিক সার, কীটনাশক, বীজ ইত্যাদির দাম নিম্ন পর্যায়ে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. গম ও ভুট্টা চাষীদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং ফসলগুলো আবাদ করে যাতে লাভবান হতে পারে তার জন্য যৌক্তিক/লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। রাসয়নিক সার, কীটনাশক, বীজ ইত্যাদির দাম নিম্ন পর্যায়ে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. গোলআলু, মিষ্টি আলু, মসল্লা জাতীয় ফসল চাষীদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভাল মানের বীজ, বালাইনাশক ও রাসয়নিক সার স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগকে গ্রহণ করতে হবে।

৪. সবজি চাষীদের সবজির ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী বাজার চ্যানেল গড়ে তুলতে হবে এবং ভালমানের বালাইনাশক সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. ফল, ঔষধি ও বিভিন্ন প্রকার কাঠ কাজ উৎপাদনকারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, ফল আমদানিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, গ্রাম এলাকায় ফল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. মাছ চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং মাছের খাদ্য স্বল্প মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. হাঁস-মুরগি পালন বৃদ্ধিকল্পে মান সম্পন্ন ঔষধ স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করতে হবে, উপজেলায় কর্মরত বিশেষজ্ঞদের সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, সূদ বিহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, সরকারী খামার থেকে ভালমানের হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ করতে হবে, বিপণন চ্যানেল গড়ে তুলতে হবে এবং তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৮. গবাদি প্রাণি পালনের ক্ষেত্রে গো-খাদ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, উপজেলা পর্যায়ে পশু ডাক্তারের পদ এবং গ্রাম পর্যায়ে মাঠকর্মীদের পদ বৃদ্ধি করতে হবে। সূদ বিহীন/স্বল্প সূদের ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, দুধ ও মাংসের পুষ্টি গুণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে করে কৃষকগণ দুগ্ধ খামার ও গবাদি প্রাণি পালন করে অধিক লাভবান হতে পারে।